ইসলামী সভ্যতায় নারী

ড. খাদিজা গরমেজ

অনুবাদ

বুরহান উদ্দিন

সংকলক

নাজিফা আঞ্জুম

জান্নাত আরা তাবাসসুম

সম্পাদনা

কাজী সালমা বিনতে সলিম

ইসলামী সভ্যতায় নারী

ড. খাদিজা গরমেজ

অনুবাদ	বুরহান উদ্দিন
সংকলণে	নাজিফা আঞ্জুম জান্নাত আরা তাবাসসুম
সম্পাদনা	কাজী সালমা বিনতে সলিম

মননে মুক্তির সৌরভ

প্রথম প্রকাশ	জমাদিউস সানি, ১৪৪৪ হিজরী পৌষ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ ডিসেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ
গ্রন্থস্বত্ব ও প্রকাশনায়	শিউলিমালা প্রকাশন
যোগাযোগ	Email : shiulimalaacademy@gmail.com Facebook. Instragram, Twitter : Shiulimala Academy
মূদ্রিত মূল্য	১৫০৳
ISBN	978-984-96935-0-5

আমাদের কথা

এক ডানায় ভর করে কি কোনোদিন কোনো পাখি উড়তে পারে? পাখির উড়তে যেমন দুটি ডানার প্রয়োজন, সভ্যতারও তেমনি দুটি ডানা রয়েছে। নারী এবং পুরুষ এর সেই ডানাদ্বয়। যদি এর কোনো এক ডানাকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে সে সভ্যতার পক্ষে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে যখনই কোনো সভ্যতা পূর্ণ গরীমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নারী-পুরুষ উভয়ের অবদানেই তা হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, সভ্যতার দুই ডানা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ নজির স্থাপন করেছিলেন রাসূল (স.)। জাহেলী যুগের সব কুসংস্কার এবং জুলুমকে পায়ের তলায় পিষ্ট করে তিনি নারীদেরকে অধিষ্ঠিত করেছেন কারামাতুল ইনসানের মর্যাদায়। তিনি মা-স্ত্রী-কন্যা হিসেবে যেমন নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তেমনি মানুষ হিসেবে, আল্লাহর খলিফা হিসেবেও তাদেরকে উপযুক্ত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি পৃথিবীকে নারীদের জন্য নিরাপদ করে গড়ে তোলার ইশতেহার দিয়েছেন। কিন্তু ইসলামী সভ্যতার পতন পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে আবার নারীরা তাদের মর্যাদা হারাতে শুরু করে। সভ্যতার চাকা যখন অক্টোপাসের মতো পেছন দিকে সাঁতার কাটতে শুরু করেছে, প্রাক-ইসলামী যুগের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা যখন মানবতাকে আবারও গ্রাস করতে শুরু করেছে, তখন নারীদেরকেও আবার পেছনের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখতে পাই, এর পঞ্চাশ শতাংশ জনগোষ্ঠীকে (নারী) নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে। একপক্ষ ধর্মীয় বয়ান দিয়ে তাদেরকে একঘরে করে রেখেছে, তো অন্যপক্ষ স্বাধীনতার কথা বলে তাদেরকে পণ্যে পরিণত করেছে। কেবল ইসলামের সঠিক বুঝাপড়াই পারে এ দুই প্রান্তিক অবস্থান থেকে বের করে এনে নারীদেরকে আশরাফুল মাখলুকাতের পূর্ণ মর্যাদা প্রদান করতে। আর সভ্যতার পুনর্জাগরণের অন্যতম পূর্বশর্ত এটি।

সৃষ্টিগতভাবে নারীর মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্য; রাসূল (স.)-এর সময় থেকে শুরু করে ইসলামী সভ্যতার বিভিন্ন সময়ে নারীদের অবস্থান; পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীদের ভূমিকা এসব বিষয় নিয়ে ড. খাদিজা গরমেজ দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে আসছেন। তার গবেষণার ফসলের একাংশ এ গুরুত্বপূর্ণ সংকলনটি। বাংলাভাষী মানুষের কাছে তার চিন্তা ও কাজ পৌঁছে দেওয়ার জন্যই আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস। গতানুগতিক ধ্যান-ধারণার বাইরে গিয়ে বইটি কোরআন-হাদীসের আলোকে যুগজিজ্ঞাসার জবাব দেওয়ার পাশাপাশি সভ্যতার কল্যাণে নারীসমাজকে তার আপন দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমরা আশা রাখছি। মহান আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করুন।

সূচিপত্র

ভূমিকা **১১**

প্রথম অধ্যায়
ইসলামী সভ্যতায় নারীদের স্বরূপ ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
আমাদের পরিবার ও সমাজজীবনকে লালনকারী মূল্যবোধসমূহ ৪৯

তৃতীয় অধ্যায়
আখলাকভিত্তিক সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা ৭৫

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সকল প্রশংসা মহান প্রভুর, যিনি আমাদেরকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন, আমাদেরকে সৃষ্টি করে আমাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন এবং নবীদের মাধ্যমে তাঁর দ্বীন পাঠিয়ে সমগ্র মানবতাকে হেদায়েতের পথে পরিচালিত করেছেন।

সালাত ও সালাম সমগ্র মানবতার জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত, দু'জাহানের সূর্য, মারহামাত, মাওয়াদ্দাত ও আদালতের প্রতীক, সর্বশেষ নবী ও শ্রেষ্ঠ মানব রাসূলে আকরাম (স.)-এর প্রতি।

মানুষ, মহাসৃষ্টি ও মহাবিশ্বের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী তা বুঝতে হলে সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কোরআন ও সুন্নতকে সামগ্রিকভাবে পাঠ করতে হবে। আমরা যদি তা করতে পারি, তাহলে দেখবো, সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও ইলাহী ওহীর সম্বোধিত (মুখাতাব) ব্যক্তি হিসেবে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো ধরনের বিভাজন নেই। মহান আল্লাহ্ নারী ও পুরুষকে একই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, তাদের উভয়কে তাঁর খলিফা হিসেবে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন এবং উভয়কেই এ দুনিয়া বিনির্মাণের দায়িত্ব দিয়েছেন। মানবতার সূচনাকাল থেকেই মানুষকে যে দায়িত্বগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো সৎ কাজের আদেশ দান ও অসৎ কাজে নিষেধ প্রদান এবং আদালত ও মারহামাতকে পৃথিবীতে বিজয়ী করা। দায়িত্ব পালনের দৃষ্টিকোণ থেকে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য হলো দায়িত্বগুলো নিজের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া এবং তা কীভাবে পালন করবে এ ব্যাপারে একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালনের স্বার্থে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই জ্ঞান, হিকমত ও মারেফাতের প্রয়োজন রয়েছে।

জ্ঞান, হিকমত ও মারেফাত ছাড়া যে দায়িত্বগুলোর কোনোটিই সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব নয়–এটি সুস্পষ্ট। আর এ কারণেই দ্বীনে মুবিন ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই জ্ঞান অর্জন ফরজ করেছে। আল্লাহর রাসূল (স.)-এর ভাষায়, "প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্যই জ্ঞান অর্জন করা ফরজ।" এ কারণে মক্কায় যে ওহীভিত্তিক সভ্যতার সূচনা হয়েছিলো, সে সভ্যতা নারীদেরকেও পরিগ্রহ করেছিলো এবং হিজরতের পূর্বে আকাবার বাইয়াতের সময় মদীনার নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহর রাসূল (স.)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন।

দুনিয়া বিনির্মাণ ও আখলাকভিত্তিক একটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের একইসাথে অভিন্ন ও ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু ইতিহাস স্বাক্ষী, যে সভ্যতাই নারীদেরকে এ সকল দায়িত্বের বাহিরে রেখেছে, সে সভ্যতা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবশালী ও সফল হতে পারেনি।

হযরত হাওয়া (আ.)-এর মাধ্যমে যে যাত্রা শুরু হয়েছিলো, তা আজও চলমান। বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যে এবং বিভিন্ন স্থানে হাজারো সমস্যার মধ্যেও জীবন যুদ্ধে ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীগণ ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন, ইনশাআল্লাহ।

ইসলাম নারীকে মূল্য দেওয়ার পূর্বে জীবন দিয়েছে। নারীদেরকে জীবন্ত কবর দেওয়ার জাহেলী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ইসলাম নারীদেরকে সর্বাগ্রে জীবনের অধিকার দিয়েছে। এরপর নারীদেরকে মূল্যবান করেছে এবং পরিবর্তীতে তাদেরকে জ্ঞানের মাধ্যমে সজ্জিত করে জ্ঞান ও মূল্যবোধ তৈরিকারী একটি সৃষ্টি হিসেবে মানবতার সামনে পেশ করেছে।

নারী ও পুরুষ উভয়কেই সতীত্ব, আমানতদারিতা, সহিষ্ণুতা, সহমর্মিতা, তাওয়াক্কুল, অন্তরের প্রশস্ততা, কৃতজ্ঞতা, সাহসিকতা ও ধৈর্যের মতো আখলাকের মৌলিক গুণাবলির অধিকারী হতে হবে। কেননা এ সকল মূল্যবোধই একটি সভ্যতাকে স্থায়িত্ব দান করে। তবে একটি সভ্যতার গঠনে যে দুইটি শক্তি সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে, সেগুলো হলো আখলাক ও জ্ঞান।

আমরা বিশ্বাস করি, আমরা আজ যে যুগে বসবাস করছি, সে যুগ ও দুনিয়াকে যদি বিন্দুমাত্র হলেও জ্ঞান, আখলাকী মূল্যবোধ ও উত্তম গুণাবলির মাধ্যমে সজ্জিত করতে পারি এবং নারীদের মধ্যে দুনিয়া বিনির্মাণকারী ও সমাজ পুনর্গঠনকারী একজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে উঠার চেতনা জাগ্রত

করতে পারি, তাহলে শুধুমাত্র মুসলমানগণই নন, সমগ্র মানবতাকেই আমরা বসবাসযোগ্য একটি দুনিয়া উপহার দিতে পারবো। কেননা আজ আমাদের সমাজ ও সময়ের যে সমস্যা, তা একইসাথে জ্ঞান, আখলাক ও মূল্যবোধের সমস্যা। নারী ও পুরুষকে অর্থাৎ ইনসানকে আমরা যতটুকু জ্ঞান ও মূল্যবোধের মাধ্যমে সজ্জিত করতে পারবো, আমরা ততটুকুই সফল হতে পারবো। অর্থাৎ আমাদের সফলতার হার ইনসানকে জ্ঞান ও আখলাকের মাধ্যমে সজ্জিত করার সমানুপাতিক; কারণ কেবলমাত্র শক্তিশালী পরিবার গঠনের মাধ্যমেই শক্তিশালী সমাজ গঠন সম্ভব।

এ কারণে নারীদেরকে শক্তিশালী, ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন, দূরদৃষ্টির অধিকারী ও সাহসী হতে হবে। নারীদেরকে জানতে হবে যে, তারা মূল্যবান ও সম্মানিত। আর এ মূল্য তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) দিয়েছেন। যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.) প্রদত্ত সম্মান ও মর্যাদা ধারণ করে পথ চলতে পারে, তাহলে তারা যে স্থানই স্পর্শ করবে, তা জান্নাতে পরিণত হবে এবং এক সময় জান্নাতকেও তাদের পায়ের নিচে বিছিয়ে দেওয়া হবে। তাদেরকে কেন্দ্র করে যে সকল ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, নারীদের উচিত সে সকল ব্যাপারে সজাগ থাকা। তাদের উচিত কোনো প্রকার রাজনীতি ও শক্তির নিকটে আত্মসমর্পণ না করে শুধুমাত্র আল্লাহর গোলাম হওয়ার দিকে নজর দেওয়া।

মহান আল্লাহ আমার বাংলাদেশী বোনদেরকে কবুল করুন এবং তাঁর সন্তুষ্টির পথে কাজ করার তওফীক দান করুন। যে সকল বিষয় মানবতার প্রয়োজন, সে সকল বিষয়ে ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে বেশি বেশি কাজ করার তওফীক দান করুন।

ড. খাদিজা কুবরা গরমেজ
২০২৩, আঙ্কারা, তুর্কিয়ে

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী সভ্যতায় নারীদের স্বরূপ

আজ সমগ্র মানবতা যখন অর্থবহতার সঙ্কটে নিপতিত হয়ে ঘোর জুলুমে দিশাহীন হয়ে পড়েছে, বিশ্বের আনাচে-কানাচে ভারসাম্যহীনতা, অন্যায়, অবিচার ও অনাচার ছেয়ে গেছে, বিশ্বজগৎ থমকে দাঁড়িয়েছে, সৃষ্টিকূল তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে, ঠিক সে মুহূর্তে আমরা সমগ্র মানবতার প্রসূতি নারী অঙ্গনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাই, বর্তমান দুনিয়া নারীদেরকে একটি ভোগের সামগ্রী হিসেবে উপস্থাপন করে গোটা মানবতাকে কলঙ্কিত করেছে। ইতিহাসের এ ভয়াবহ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা স্মরণ করছি আমাদের সুমহান ইসলামী সভ্যতার গৌরবদীপ্ত উত্তরাধিকারকে। ইসলামী সভ্যতা এমন একটি সভ্যতা, যা ইলাহী প্রত্যাদেশে নববী হিকমতের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গোটা বিশ্বমানবতাকে আলোকিতকারী সুদীর্ঘ বারোশত বছর স্থায়ী এক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলো। আজ সে গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা প্রতিষ্ঠাকারী মুসলিম উম্মাহ অধঃপতিত, নিষ্পেষিত, জরাজীর্ণ, দিশাহীন একটি অবয়ব নিয়ে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে আছে। আজ উম্মাহর নারীদেরকে সকল দিক থেকে পশ্চাৎপদ করে রাখার, দমিয়ে রাখার এক ভয়াবহ প্রবণতাকে এ উম্মাহ তাদের দৈনন্দিন ওজিফা বানিয়ে নিয়েছে। এ ভয়াবহ জুলুম ও দুর্দশার মূলে সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স.)-এর আদেশকে নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে অথবা ভুলভাবে বা খণ্ডিতভাবে ব্যাখ্যা করে তা প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা, অর্থাৎ মানুষের আকল ও ফিতরাত বহির্ভূত ধর্মীয় বয়ান ও তার অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যার ছড়াছড়ি। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে ইসলামী ধর্মতত্ত্বের সঠিক বয়ান ও বিশ্লেষণ আমাদের সামনে হাজির থাকা জরুরী।

আজ আমরা জানি না মানব সৃষ্টিতত্ত্বের হাকীকত কী! আমরা জানি না কোরআনে বর্ণিত বিভিন্ন উপমা দ্বারা আল্লাহ এ উম্মাহর সামনে কোন

ধরনের নারী চরিত্রকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ মুসলিম নারীদের কেমন হওয়া উচিত, এ ব্যাপারে ইলাহী ইরাদা কী তার কোনো সঠিক বুঝাপড়া আমাদের নেই। পাশাপাশি বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (স.) ইসলামী সভ্যতা বিনির্মাণে নারীদের কেমন মর্তবা দিয়েছেন এবং তারই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে পরবর্তীতে ইসলামী স্বর্ণযুগে আমাদের পূর্বসূরি নারীরা এ পৃথিবী বিনির্মাণে অংশগ্রহণ করে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত 'ইসতিখলাফ' বা খেলাফতের দায়িত্ব কীভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন তার সঠিক কোনো বয়ান আমাদের সামনে দেখতে পাই না। তাই আজ ইসলামী সমাজ, সংস্কৃতি ও সভ্যতা গঠনে নারীদের অবস্থানকে শনাক্ত করতে আমাদের প্রয়োজন ইসলামী জ্ঞানের প্রাথমিক উৎস কোরআন এবং পর্যায়ক্রমে হাদীস ও ইসলামী সভ্যতার ইতিহাস থেকে নজির পেশ করে একটি ধারাবাহিক এবং সামগ্রিক অবয়বে তা অনুধাবন করা।

আমাদের ইতিহাস পর্যবেক্ষণে এ বিষয়টি প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (স.) সমগ্র মানবতার কাছে শান্তির বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে সকল ক্ষেত্র নিয়ে সংগ্রাম করেছেন, তার মধ্যে তিনটি ক্ষেত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ক্ষেত্র তিনটি হলো–

১. নারী
২. জ্ঞান ও মূল্যবোধ
৩. আখলাক

রাসূল (স.)-এর এ তিনটি বড় বড় ক্ষেত্রের বিপ্লব পরস্পর সম্পর্কহীন নয়, বরং ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং একটি অপরটির অবিচ্ছেদ্য অংশ। নারীদের ব্যাপারে তাঁর করা কাজসমূহের মাঝে একটি হলো নারীদেরকে তিনি মানুষের মর্যাদায় আসীন করেছেন এবং আল্লাহর খলিফা হিসেবে তাদেরকে সমান মর্যাদা দিয়েছেন। নারীদেরকে মূল্য দেওয়ার আগে তিনি তাদের জীবন দান করেছেন। জাহেলী যুগে নারীদের জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রচলিত প্রথা উচ্ছেদ করে তিনি তাদেরকে নতুন জীবন দান করেছেন এবং মানবীয় মর্যাদায় উপনীত করে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সুন্দর আসনে সমাসীন করেছেন। আমরা জানি, রাসূল (স.)-এর ইসলাম প্রচারের পূর্বে আরব সমাজ এমন একটি সমাজ ছিলো, যেখানে না ছিলো আদালত, না ছিলো মানবিক মর্যাদা, না ছিলো জ্ঞান, না ছিলো মীযান। ফলশ্রুতিতে তারা ছিলো একটি মুখাপেক্ষী জাতি। রাসূল (স.) তাদের সকল কুসংস্কারের

স্থানে ওহী কেন্দ্রিক জ্ঞান এবং হিকমতকে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ সময়ে সাহাবীরা তাঁর আনিত বিধান শেখার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আর এ জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুরুষ সাহাবীরা নন, নারী সাহাবীরাও সচেষ্ট ছিলেন। অর্জিত সে জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্ম বা অন্যদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রচেষ্টা ইতিহাসে স্মরণীয়।

সাহাবীদের জ্ঞানার্জনের মূল কেন্দ্র ছিলো মসজিদে নববী। নববী যুগে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের জামাতে শুধুমাত্র পুরুষরা নন, নারীরাও অংশগ্রহণ করতেন এবং এ সুযোগ তাদের জন্য ছিলো। এ কারণেই মসজিদে নববীতে রাসূল (স.) তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে যে সকল কথা বলতেন, তা থেকে নারী সাহাবীরাও সমানভাবে উপকৃত হতেন। সে মজলিসগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণ বা উপস্থিতি মোটেই কম ছিলো না, বরং তা ছিলো পুরুষ সাহাবীদের প্রায় সমপরিমাণ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, রাসূল (স.)-এর ওফাতের পরে মুসলমানরা তাঁর সময়ে প্রচলিত এ বিষয়টির ধারাবাহিকতা জারি রাখতে পারেননি বা জারি রাখতে চাইলেও সে সুযোগ লাভ করতে সক্ষম হননি। ফলে পরবর্তীতে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, মসজিদ যেন শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে! এভাবে প্রায় প্রতিটি সমাজে বৃদ্ধা, যুবতী নির্বিশেষে সকল নারী, এমনকি মেয়ে শিশুরাও আস্তে আস্তে মসজিদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো বনী ইসরাইলরা নারীদেরকে মসজিদে ঢুকতে দিতো না, তখন নারীদের জন্য মসজিদ নিষিদ্ধ ছিলো। আল্লাহ্ বনী ইসরাইলের এ প্রথা পরিবর্তন করে দেন হযরত মরিয়ম (আ.)-এর মাধ্যমে। তার মা তাকে মসজিদের জন্য ওয়াকফ বা উৎসর্গ করে দেন, এমনকি তিনি মসজিদেই লালিত-পালিত হন। হযরত মরিয়ম (আ.)-এর মাধ্যমে সূচিত নারী এবং মসজিদের মধ্যকার এ সম্পর্ক মুসলিম নারীদের জন্য রেখে যাওয়া একটি অসাধারণ উত্তরাধিকার। এ উত্তরাধিকার আমাদেরকে ধারণ করতে হবে এবং লালন করতে হবে, এমনকি আমাদের পরবর্তী বংশধরদের জন্য এ ধারাকে জারি রাখতে হবে।

নববী যুগে জ্ঞান বলতে কেবল ওহীভিত্তিক জ্ঞানকে বুঝাতো না। রাসূলুল্লাহ (স.) শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া ওহীভিত্তিক জ্ঞানকেই গুরুত্ব দেননি, একইসাথে আকলী বা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের প্রতিও জোর দিয়েছিলেন। তিনি সকল জ্ঞান একত্রিত করে একটি জ্ঞানের বিপ্লব সংঘটিত

করেছিলেন। দ্বীনি জ্ঞান এবং অদ্বীনি জ্ঞান–এ রকম কোনো বিভাজন আমাদের ইসলামী সভ্যতার জ্ঞানের ইতিহাসে নেই। তাফসীর, ফিকহ্, কালাম যেমন ইসলামী জ্ঞান, মেডিসিন, আইন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতিও তেমনি ইসলামী জ্ঞান, মানবিক তথা ইনসানী জ্ঞান।

উসমানী খেলাফতের একজন বিখ্যাত আলেম তাশখরুপযাদে তার *মিফতাহুস সাদা* গ্রন্থে জ্ঞানকে দু'টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা–

১. ইলমুল আদইয়ান বা দ্বীনি জ্ঞান।
২. ইলমুল আবদান বা শরীর সম্পর্কীয় জ্ঞান।

আমরা ইলমুল আদইয়ান তথা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করবো, যেন পরবর্তী জীবন তথা আখেরাতে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে জান্নাত লাভ করতে পারি। অপরদিকে ইলমুল আবদান তথা শরীর সম্পর্কীয় জ্ঞান হলো মেডিসিন সংক্রান্ত জ্ঞান। এ জ্ঞান আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখবে। এ জ্ঞান খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শরীর অসুস্থ হলে মানুষ না জ্ঞান অর্জন করতে পারবে, আর না ইবাদত করতে পারবে। ফলশ্রুতিতে ইলমুল আদইয়ান তথা দ্বীনি জ্ঞান অর্জনও সম্ভব হবে না। অর্থাৎ সে আখেরাতের জন্য দুনিয়ার জীবনে কিছুই অর্জন করতে পারবে না। এ কারণে আল্লাহর রাসূল (স.) জ্ঞানের মধ্যে কোনো ধরনের বিভাজন না করে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি অর্থ দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ করে নিজের স্ত্রীদেরকে লেখা-পড়া শেখানোর ব্যবস্থা করেছেন।

রাসূল (স.)-এর তৃতীয় যে বড় বিপ্লব, সেটি হলো আখলাক এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিপ্লব। তিনি বলেছেন,

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ

অর্থ : "আমি উত্তম আখলাককে পূর্ণতা দান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

এটি আল্লাহর রাসূল (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদীস। এ হাদীস রাসূল (স.)-এর রিসালাতের উদ্দেশ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার রিসালাতের অন্যতম একটি অংশ হলো আখলাক ও মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

অর্থ : "নিঃসন্দেহে আপনি একটি বড় আখলাকের উপর প্রতিষ্ঠিত।"

হযরত আয়েশা (রা.)-কে রাসূল (স.)-এর আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন,

خُلُقُهُ اَلْقُرْآنَ

অর্থ : "কোরআনই তার আখলাক।"

এ কারণে রাসূল (স.) মূল্যবোধ এবং আখলাকের দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র মানবতার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এবং ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নারী এবং মূল্যবোধের মধ্যকার সম্পর্কের যে প্রমাণ রাসূল (স.) দিয়েছেন; স্ত্রী হিসেবে, বোন হিসেবে, মা হিসেবে, সর্বোপরি মানুষ হিসেবে নারীদেরকে তিনি যে মর্যাদা দিয়েছেন, তা হযরত খাদিজা (রা.)-এর উপর ভিত্তি করে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করা যায়।

হযরত খাদিজা (রা.) এমন একজন ব্যক্তি, যিনি ছিলেন রাসূল (স.)-এর আনিত বিধান সর্বপ্রথম গ্রহণকারী। রাসূল (স.)-এর সকল ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি ছিলেন সার্বক্ষণিক সাথী। তাঁর সকল সমস্যা সমাধানে ছিলেন ঐকান্তিক। তিনি ছিলেন রাসূল (স.)-এর সন্তানদের মা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল (স.) ও হযরত খাদিজা (রা.)-এর সম্পর্ক একটি বিশেষ সম্পর্ক, যে সম্পর্ক কখনো অন্য কিছুর সাথে মেলানো যায় না। রাসূল (স.)-এর জীবনে হযরত খাদিজা (রা.)-এর ভূমিকা বা প্রভাব এতই বেশি যে, তার মৃত্যুর বছরকে রাসূল (স.)-এর জীবনের দুঃখের বছর হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

ওহী প্রাপ্তির পর রাসূল (স.) সর্বপ্রথম খাদিজা (রা.)-এর কাছে এসে এ ব্যাপারে জানালে তাঁদের মধ্যে যে কথপোকথন হয়, তা আমাদের নতুন করে স্মরণ করা উচিত। হেরা গুহায় রাসূল (স.)-এর প্রতি জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে "اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ" আয়াতটি নাযিল হলে তিনি খুব ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তিনি সেখান থেকে দৌড়ে এসে সর্বপ্রথম খাদিজা (রা.)-এর কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করেন। রাসূল (স.)-কে সর্বপ্রথম বিশ্বাসকারী, ঈমান আনয়নকারী এবং এ পথে যাত্রাকারী ব্যক্তি একজন নারী এবং তিনি হলেন হযরত খাদিজা (রা.)। উক্ত অবস্থায় তিনি রাসূল (স.)-কে যে কথাগুলো বলেছিলেন, তা এখনো বিশ্ব মানবতার ইতিহাসে ইশতেহার হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে।